পত্নীতলার কাজী বানু হত্যাকান্ড

Uv‡MU m¤úwË AvZ¥mvr

লিখেছেন **হাসান আজাদ**

কাজী আখতার বানু গ্রামের বাড়িতে একাই থাকতেন। তার তিন ছেলের মধ্যে বড় ছেলে কাজী ছাইদুল হালিম শামীম ও ছোট ছেলে কাজী শাহেদুল হালিম শাহেদ ফিনল্যান্ডে থাকতেন। মেজ ছেলে ডা. কাজী শফিকুল হালিম জিম্মু গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত ছিলেন। কাজী বানু একা থাকার কারণে পারিবারিক কাজে সহায়তা করার জন্য ১৯ বছর বয়সী মাসুম নামে একজন কাজের ছেলে রাখেন। মাসুম সব সময় কাজী বানুর বাড়িতে থাকতো। গত ২৫ জুন রাত আনুমানিক ২.৩০ মিনিটে কাজী বানুর দ্বিতীয় ছেলে ডা. জিম্মু ঢাকা থেকে বাড়িতে পৌঁছান। বাড়ির বাইরে মূল ফটকে ঢোকার পর বাসভবনের সামনের ব্যালকনির লাইট বন্ধ দেখতে পান। সাধারণত রাতে লাইট জ্বালানো থাকে। ডা. জিম্মু বাড়িতে ঢোকার ফটকে এসে ১০ থেকে ১৫ বার কলবেলে টিপ দেন। তারপরও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি ফটকের ছিটকিনিতে হাত দিয়ে দেখেন ছিটকিনি খোলা। রাতের বেলায় এ ছিটকিনি বন্ধ থাকার কথা। তিনি ফটক খুলে ব্যালকনির আলো জ্বেলে দেখতে পান তার মা কাজী বানু রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। তিনি বাইরে এসে চিৎকার করতে থাকলে আশপাশের প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। ডা. জিম্মু প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পান ঘরের প্রত্যেকটি রুমের জিনিসপত্র তছনছ করা। কাজের ছেলে মাসুমের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে তার ব্যবহৃত রক্তাক্ত ফুলশার্ট পাওয়া যায় ডাইনিং রুমের সামনে এবং তার ব্যবহৃত লুঙ্গি, গেঞ্জি, গামছা ভেজা অবস্থায় পাওয়া যায় বাথরুমে। যা রক্তাক্ত অবস্থায় ছিলো। কাজী আখতার বানু যে রুমে থাকতেন সেই রুমের আলমিরার ভেতরে সব কাগজপত্র তছনছ করা হয়েছে। আলমিরার একটি ড্রয়ারে এ পরিবারের সব সম্পত্তির দলিল রাখা হতো। এ ড্রয়ারে কিছু দলিলপত্র থাকলেও বেশ কিছু খোয়া গেছে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি কাজী বানুর ছোট ছেলে কাজী শাহেদের রুম থেকে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের একটি ল্যাপটপ ও একটি ডিভিডি প্লেয়ার দুষ্কৃতকারীরা নিয়ে গেছে। সঙ্গে ফ্যামিলি সাইজের একটি আধুনিক ব্রিফকেস। উল্লেখ্য, ছোট ছেলে কাজী শাহেদ গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩-এ ফিনল্যান্ড থেকে একাডেমিক গবেষণার কাজে বাংলাদেশে আসেন।

কাজী আখতার বানুর মৃতদেহের পাশে প্রায় ৫ কেজি ওজনের একটি হাতুড়ি পাওয়া যায়। গ্যাসের চুলায় মাংসের তরকারি রান্না করা হচ্ছিল এবং মৃতদেহের হাতের পাশে রান্নার জন্য প্রস্তুত আদা পাওয়া যায়

কাজী আখতার বানুর মৃতদেহের পাশে প্রায় ৫ কেজি ওজনের একটি হাতুড়ি পাওয়া যায়। গ্যাসের চুলায় মাংসের তরকারি রান্না করা হচ্ছিল এবং মৃতদেহের হাতের পাশে রান্নার জন্য প্রস্তুত আদা পাওয়া যায়।

কাজী বানুর বাড়ির নিচতলার বর্ধিত অংশ এবং দোতলার কাজ চলছিলো। মাসুম এ বাড়িতে কাজ করার আগে নির্মাণ শ্রমিক রাজমিস্ত্রী নূর ইসলামের অধীনে জুগালির কাজ

করতো। সেই সুবাদে কাজী বানু মাসুমকে ছেলের মতো আদর করতেন। এক পর্যায়ে তার বাড়িতে কাজ করার জন্য বললে মাসুম রাজি হয়ে যায় এবং স্থায়ীভাবে কাজ শুরু করে।

কোঁচো খুঁড়তে সাপ

কাজী আখতার বানু হত্যাকান্ডের পর নজিপুরবাসী প্রথমে মনে করেছিলো নিছক ডাকাতি করতে তাকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু হত্যাকান্ডের পর দিন যত অতিবাহিত হতে লাগল, ততই নানান কথা নজিপুরবাসীর মুখে মুখে রটতে লাগলো। কেউ কেউ বলল, এটা ডাকাতির ঘটনা নয়, অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। আবার কেউ বলল, সম্পত্তি আত্মসাতের লক্ষ্যে একটি স্বার্থান্বেষী মহল এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। তবে নজিপুর বাসিন্দাদের কেউ বিশ্বাস করতে রাজি নয় যে, শুধু ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে তাকে খুন করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কাজী বানুর স্বামী শহীদ কাজী আব্দুল জব্বারের মৃত্যুর পর স্বাধীনতা- পরবর্তী সময়ে কাজী পরিবারের অন্যদের সঙ্গে সম্পত্তি বিরোধ সৃষ্টি হয়। কাজী বানুসহ তার পিতৃহীন ৩ সন্তানকে পিতৃভূমি থেকে উৎখাত করার জন্য কাজী পরিবারের কাজী আব্দুল মজিদ, কাজী আব্দুল হামিদ ও কাজী নবীর উদ্দীনের (বর্তমানে মৃত) পরিবারের সদস্য কাজী আখতার হোসেন তারা, কাজী আলতাফ হোসেন বুলু, কাজী আতোয়ার হোসেন বিনু, কাজী মঞ্জু এবং কাজী বদিউল বিভিন্ন সময় বাড়ির সীমানা ও সংলগ্ন পুকুর নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করে মারধর করতো এবং তাদের হুকুম মতে সবকিছু নির্ধারিত হতো।

কাজী বানুসহ তার পিতৃহীন ৩ সন্তানকে পিতৃভূমি থেকে উৎখাত করার জন্য কাজী পরিবারের কাজী আব্দুল মজিদ, কাজী আব্দুল হামিদ ও কাজী নবীর উদ্দীনের (বর্তমানে মৃত) পরিবারের সদস্য কাজী আখতার হোসেন তারা, কাজী আলতাফ হোসেন বুলু, কাজী আতোয়ার হোসেন বিনু, কাজী মঞ্জু এবং কাজী বদিউল বিভিন্ন সময় বাড়ির সীমানা ও সংলগ্ন পুকুর নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করে মারধর করতো এবং তাদের হুকুম মতে সবকিছু নির্ধারিত হতো

একই এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ১৯৭১ সালের আগে কাজী বানুর শ্বশুর কাজী তাজের মোহাম্মদ সব সন্তানের জন্য মৌখিকভাবে সম্পত্তি বন্টন করে দেন। কাজী আব্দুল জব্বার জীবিত থাকাকালীন বন্টন অনুযায়ী সম্পত্তি ভোগদখল করতে থাকেন। তিনি যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর কাজী মজিদ পরিবারের কাজী আখতার হোসেন তারা ওরফে তারা কাজী, কাজী আলতাফ হোসেন বুলু ওরফে বুলু কাজীসহ কাজী পরিবারের আরো কয়েকজন সদস্য মিলে কাজী বানু ও তার সন্তানদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বেশকিছু সম্পত্তি দখল করে নেয়। এর মধ্যে কাজী বানুর বাড়ির পুকুরপাড় সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের আনুমানিক ২ বিঘা জমি দখল করে এবং চাষাবাদ করা শুরু করে। এছাড়া আরো বেশ কিছু জমি তারা দখল করে যা আনুমানিক ৪ বিঘা হবে। এ নিয়ে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে কাজী বানু তার সম্পত্তি উদ্ধারের দাবি জানালে দখলকারীরা বিশেষ করে কাজী মজিদ ও কাজী হামিদ পরিবারের লোকজন তাদের হুঁশিয়ার করে দেয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একই গ্রামের বাসিন্দা জানায়, কাজী আখতার বানু হত্যার আগে দখলকৃত জমি ফেরত চাইতে গেলে দখলকারীরা মৃত কাজী রিয়াজ উদ্দিনের (কাজী তাজের মোহাম্মদের বড় ছেলে) পরিবারের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো ভাগবাটোয়ারা হবে না বলে জানিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, শরিকানা জমি নিয়ে কাজী রিয়াজউদ্দিনের সন্তানরা কাজী আব্দুল হামিদ ও কাজী আব্দুল মজিদের পরিবারের সঙ্গে মামলায় নেমেছে, যা এখনো চলছে। এ মামলায় কাজী আব্দুল জব্বারের সন্তানদের পক্ষে তাদের মাতা কাজী আখতার বানু অংশীদার হন। আরো জানা যায়, শরিকানা জমি ভারত থেকে বাংলাদেশে একচেঞ্জ করে নিয়ে আসার সময় কাজী আব্দুল হামিদ ও কাজী আব্দুল মজিদের পরিবার অসদুপায় অবলম্বন করে কাজী আব্দুল মজিদের ছেলে তারা কাজী ও তার স্ত্রী কাজী আয়েশা এবং কাজী আব্দুল হামিদ তার ছেলে কাজী মঞ্জুকে মোট সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে পাওয়ার অব এটর্নিতে নাম দেয়। এ বিষয় নিয়েও কাজী বানু আপত্তি করায় মজিদ কাজী পরিবারের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি হয়। কাজী বানুর শ্বশুর জীবিত থাকাকালীন তার সব সম্পত্তি সন্তানদের নামে

কাজী আখতার বানুর পরিচয়

হত্যাকান্ডের আগমূহূর্ত পর্যন্ত কাজী আখতার বানু ছিলেন পত্নীতলা মহিলা আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ মহিলা সমবায় সমিতির সভানেত্রী। পত্নীতলা থানা নারী নির্যাতন দমন কমিটির সদস্য, নজিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গভর্নিং কমিটি সদস্য এবং উপজেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন প্রায় দশ বছর। এছাড়াও তিনি পত্নীতলার বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বর্তমানে কাজী আখতার বানুর বড় ছেলে কাজী ছাইদুল হালিম শামীম ফিনল্যান্ডে একটি কলেজের লেকচারার। মেজ ছেলে কাজী শফিকুল হালিম জিম্মু পেশায় একজন ডাক্তার এবং ছোট ছেলে কাজী শাহেদুল হালিম শাহেদ ফিনল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করছেন। পত্নীতলা থানায় কাজী আখতার বানুর পরিবারের মতো শিক্ষিত পরিবার আর দ্বিতীয়টি নেই।

কাজী আখতার বানু ও তার পরিবার পত্নীতলায় এতোটাই জনপ্রিয় ছিল যে হত্যাকান্ডের দিন বেশ কয়েকজন রিকশাওয়ালা রিকশাই চালায়নি। পত্নীতলাসহ আশপাশের থানাগুলো থেকে পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ঢল নামে। শুধু একবার কাজী আখতার বানুর লাশ দেখতে। সেদিন অঝোরে ঝরেছিলো সাধারণ মানুষের চোখের পানি। নৃশংস এ হত্যাকান্ডের পর সাধারণ মানুষের মুখে মুখে একটাই প্রশ্ন, কে তাকে খুন করলো? এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তিনি এতোটাই কোমলমতি ও সহজ-সরল মানুষ ছিলেন যে, তার কেউ শত্রু থাকতে পারে তা কল্পনার বাইরে। রাজনৈতিকভাবেও তিনি সব দলের নেতা-কর্মীদের কাছে সমান জনপ্রিয় দিলেন। এ ব্যাপারে তার বড় ছেলে কাজী ছাইদুল হালিম শামীম জানান, মা আমাদের অনেক কষ্টে মানুষ করেন। আমরা তিন ভাই এখন স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আমরা যখন মাকে নিয়ে সুন্দর সুখের নীড় গড়ার স্বপ্ন দেখলাম, তখনই আমার মাকে খুন করা হলো। জানি না কারা খুন করেছে। আমরা আমাদের মায়ের হত্যার সঠিক বিচার চাই। এ জন্য চাই সকলের সহযোগিতা।

সমবন্টন করে দেন। পরবর্তীতে এ সমবন্টনের একটি দলিলও তৈরি হয় বলে একটি সূত্র দাবি করে। তবে বাটোয়ারার কাগজ কোন পরিবারের কাছে আছে তা কাজী গোষ্ঠীর সব পরিবারের কাছে রহস্যজনক হয়ে ওঠে। সূত্রের দাবি অনুযায়ী, কাজী পরিবারে কাজী আখতার বানু শিক্ষিত হওয়ায় তার কাছে বাটোয়ারার কাগজ আছে বলে অন্যান্য শরিক বিশেষ করে মজিদ কাজী ও হামিদ কাজীর পরিবার মনে করতো। এ বাটোয়ারার কাগজের জন্য হামিদ ও মজিদ কাজীর পরিবারের তারা কাজী, বুলু কাজী, বিনু কাজী ও মঞ্জু কাজী মরিয়া হয়ে ওঠে বলে জানা যায়। এ নিয়ে হত্যাকান্ডের আগে কাজী পরিবারের অন্যদের সঙ্গে কথাও বলে। এ কাগজ পেলে রিয়াজ কাজীর পরিবারের সঙ্গে মামলায় তাদের হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এলাকাবাসী অনেকেই মনে করে, এ হত্যাকান্ড বাটোয়ারার কাগজের জন্যই হয়েছে।

এছাড়া নজিপুর বাসস্ট্যান্ডে কাজী আখতার বানুর মার্কেটের জমি নিয়ে কাজী গোষ্ঠীর অপর সদস্য মোঃ মজিবর রহমানের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৯৯০ সালে এ বিরোধ নিয়ে মামলা শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে। এ মার্কেটের জমি বিরোধেও মজিদ কাজীর পরিবার এবং এ পরিবারের জামাতা বর্তমান নওগাঁ-২ আসনের বিএনপি সংসদ সদস্য শামসুজোহা খান মজিবর রহমানের পক্ষে অবস্থান নেন বলে জানা যায়।

কাজের ছেলে মাসুম পাশের গ্রাম প্রফেসরপাড়ার জনৈক নাছিরের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো। আর ঐ নাছিরের বাড়িতে আবুবকর নামে একজন গাড়িচালক ভাড়া থাকতো। এই গাড়িচালক বর্তমান এমপির মালিকানায় থাকা যেকোনো একটি গাড়িরচালক। এই চালকের সঙ্গে তার সখ্য ছিল বেশি। ঘটনার পর নাছির ও ড্রাইভার পলাতক রয়েছে। মাসুমের পিতা লোকমান আলী বলেন, আমার ছেলে খারাপ সত্য। তবে খুন করার মতো সাহস তার নেই। আর একা সে খুন করতে পারে না। তার পেছনে কেউ আছে। বাড়িতে গয়নাগাটি, টাকাসহ অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র থাকতে তার কিছুই না নিয়ে সব রুমের কাগজপত্র তছনছ এবং কিছু দলিলপত্র খোয়া যাওয়ায়- এটা যে কেবল ডাকাতির ঘটনা নয়, বরং পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকান্ড তা অনেকেই মনে করছেন। গ্রামবাসী মনে করছে, মাসুম ছিল হত্যাকান্ড পরিকল্পনার একটি চাবি। তাকে দিয়ে কাজী বানুর পরিবারের সব তথ্য জানাই ছিল পরিকল্পনাকারীদের কাজ। কেউ কেউ আবার বলছে, কাজী বানু হত্যাকান্ডের ৪ দিন আগে থেকেই বাড়িতে একা ছিলেন। যেদিন তার মেজ ছেলে ডা. জিম্মু বাড়িতে আসার কথা সেদিনই তাকে হত্যা করা হয়। তাহলে কি ডা. জিম্মুও তাদের টার্গেট ছিল? এমন প্রশ্নও উঠেছে গ্রামবাসীর মনে। একই সূত্র জানায়, হত্যাকান্ডের দিন তারা কাজী তার নিজ বাড়িতে ছিলেন না। এবং রাতে হত্যাকান্ডের পর খুব ভোরে তারা কাজীকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত অবস্থায় রাস্তায় দেখা গেছে। কাজীপাড়ার কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়টির সত্যতা পাওয়া যায়। কাজী বানু একই গোষ্ঠীর হলেও তারা কাজী ও তার পরিবারের কেউ হত্যাকান্ডের পর মৃতের লাশ বা জানাজায় অংশগ্রহণ করেনি। এর কয়েক দিন পর তারা কাজী নিজের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে নজিপুরে এক ভাড়া বাসায় ওঠায় অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এদিকে অন্য একটি সূত্র জানায়, হত্যাকান্ডের ৭-৮ দিন পর মজিদ কাজীর পরিবারের সব পুরুষ সদস্য পাশের আত্রাই নদীর চরে একটি গোপন মিটিং করে। হত্যাকান্ডের পর পুলিশ সন্দেহজনকভাবে রাজমিস্ত্রীদের প্রধান নূর ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর পত্নীতলা থানা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন গত ৪ জুলাই তার মুক্তির দাবিতে মিছিল করে। পাশাপাশি তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য থানায় চাপ সৃষ্টি করে। পুলিশের একটি সূত্র জানায়, মিছিল বের করা এবং নূর ইসলামকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে বর্তমান সংসদ সদস্যের ইন্ধন রয়েছে। তবে গ্রামবাসী জানায়, রাজমিস্ত্রী নূর ইসলাম পরহেজগার লোক। এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে সে জড়িত থাকতে পারে না। একই সূত্র জানায়, বর্তমানে এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল 'এমপির লোক' বলে ব্যাপক পরিচিত। এমপিই তাকে এই থানায় নিয়ে আসেন। এমপির স্বার্থে মোস্তফা কামাল পারে না এমন কোনো কাজ নেই। আর এই মোস্তফা কামালের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীরও রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। অনেকেই মনে করছে, এই হত্যাকান্ডের তদন্তভার যদি মোস্তফা কামালের হাতে থাকে তাহলে কখনোই সুষ্ঠু তদন্ত হবে না।

অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, হত্যাকান্ডের বেশ কিছুদিন পর পত্নীতলা থানায় কে বা কারা একটি উড়ো চিঠি পাঠায়। চিঠিতে একটি মানচিত্র এঁকে বেশ কয়েকজনের নাম ও তাদের বর্তমান অবস্থান উল্লেখ করে বলা হয় কাজী বানু হত্যাকান্ডের সঙ্গে তারা জড়িত। পুলিশের একটি সূত্র উড়ো চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। একই সূত্র জানায়, এই চিঠিতে যাদের নাম উল্লেখ করা হয় তারা সবাই পত্নীতলার দিনমজুর, রিকশাওয়ালা এবং মাদকসেবী।

এরা সবাই এখন পত্নীতলাতেই অবস্থান করছে। এ নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যেও প্রশ্ন উঠেছে। এসব দিনমজুর, রিকশাওয়ালা ও মাদকসেবী কাজী বানু হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকলে তারা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতো না। আর যারা উড়ো চিঠি পাঠিয়েছে, তারা কি কাজী বানু হত্যাকান্ড সম্পর্কে আগে থেকেই জানতো? অথবা হত্যাকান্ডের সময় কি প্রত্যক্ষদর্শী ছিল? নাকি হত্যাকান্ডের তদন্তের গতিপথ পরিবর্তনের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা- এমন প্রশ্ন স্বয়ং পত্নীতলা থানা পুলিশের মধ্যে উঠেছে। পুলিশের অপর একটি নির্ভরযোগ্য সোর্স জানায়, হত্যাকান্ডের পর বাড়ির বিভিন্ন চিহ্ন দেখে বোঝা যায়, দুষ্কৃতকারীরা ডাকাতি করতে আসেনি। কারণ ডাকাতি করতে এলে তারা টাকা-পয়সা লুটপাট করতো। কিন্তু তা করেনি। সব আসবাবপত্র খুলে তারা কাগজপত্র তছনছ করেছে। এসব দেখে বোঝা যায় তারা কোন ধরনের কাগজের জন্য এসেছে। কাজী বানুর কাছে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ বলতে দলিলই থাকতে পারে। আর দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে দু-একজন অবশ্যই লেখাপড়া জানা লোক ছিল। স্রেফ ডাকাতির উদ্দেশে এলে কাগজপত্র এভাবে তছনছ করতো না। আর করলেও তারা কয়েকটি দলিল না নিয়ে সব কাগজপত্র নিয়ে যেতো। কিন্তু সব কাগজপত্র তছনছ করে মাত্র কয়েকটি কাগজপত্র নেয়। যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই হত্যাকান্ড ঘটেছে। কাগজপত্র বা দলিলের সূত্র ধরে তদন্ত চালালে হত্যাকারী চিহ্নিত করা যাবে বলে ঐ পুলিশ কর্মকর্তা মনে করেন। কিন্তু তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা এই বিষয়টিতে আমল না দিয়ে আসামি মাসুমকে খুঁজতে সময় দিচ্ছেন বেশি। অনেকেই মনে করছেন, দুষ্কৃতকারীরা মাসুমকে চাবি হিসেবে ব্যবহার করলেও তাকে বাঁচিয়ে না রাখার সম্ভাবনা বেশি। কারণ মাসুমই হত্যাকান্ডের একমাত্র সাক্ষী।

এদিকে প্রধান আসামি মাসুমের কোনো ধরনের ফটো না থাকায় পুলিশও তাকে চিহ্নিত করতে পারছে না। হত্যাকান্ডের সময় বাড়িতে চুরি যাওয়া ল্যাপটপের মধ্যে মাসুমের ছবি ছিল বলে জানিয়েছে নিহতের পরিবার। অন্যদিকে,

হত্যাকান্ডের তিন দিন পর আত্রাই নদীতে একটি লাশ ভেসে ওঠে। লাশ দেখে পুলিশ প্রথমে মাসুমের লাশ মনে করলেও পরে মাসুমের বাবা তার ছেলের লাশ নয় বলে শনাক্ত করেন। এই ভেসে ওঠা লাশ মাসুমের মৃতদেহ হিসেবে দেখানোর জন্য একটি মহল তৎপর ছিল বলে জানা যায়।

মজিদ কাজী পরিবারের দৌরাত্ম্য

কাজী আব্দুল মজিদ ওরফে মজিদ কাজীর পরিবারের যেকোনো সদস্য পত্নীতলাবাসীর কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। মজিদ কাজী ও তার সন্তানরা বিএনপিতে যোগ দেয়ার পর তারা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এর অন্যতম কারণ বর্তমান সংসদ সদস্য। মজিদ কাজী এতোটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাকে নিজ বাড়িতে ধরে এনে গাছের সঙ্গে বেঁধে অথবা ঝুলিয়ে মারধর করতো। পত্নীতলার কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্বাধীনতার পর মজিদ কাজী শত্রু সম্পত্তি দখল ও ব্যাপক লুটপাট চালিয়েছে। ১৯৭৫ অথবা '৭৬ সালে মজিদ কাজীর আপন ভাইয়ের ছেলে রাজ্জাক কাজীকে মজিদ কাজীর ছেলে তারা কাজী ও বুলু কাজী ব্যাপক মারধর করে এবং রাজ্জাক কাজীকে পৈতৃক ভিটা ছাড়তে বাধ্য করে। পরবর্তীতে রাজ্জাক কাজীর সব সম্পত্তি মজিদ কাজীর পরিবার দখল করে নেয়, যা বর্তমানেও তাদের দখলে আছে। আর পৈতৃক ভিটা ছেড়ে রাজ্জাক কাজী সপরিবারে পার্শ্ববর্তী থানা সাপাহারে বসবাস করছেন। এ ছাড়া কাজী আব্দুল আজীজের ছেলে দুলু কাজী, তারা কাজী, বুলু কাজী ও তার ভাইদের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে পৈতৃক নিবাস ছেড়ে বর্তমানে নজিপুর বাসস্ট্যান্ডে বসবাস করছেন। একই গোষ্ঠীর কাজী আব্দুল আজিজের ছেলে কাজী আল মাসুদকে সামান্য ব্যাপারে তারা কাজী গাছে ঝুলিয়ে মারধর করে। মৃত্যুপথযাত্রী মাসুদ নিতান্ত ভাগ্যজোরে মৃত্যুপথ থেকে ফিরে আসে। মজিদ কাজীর পরিবারের লোকজন তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এখানেই শেষ করেনি। ২০০১ সালের কোনো এক সময়ে রাজ্জাক কাজী তার পৈতৃক সম্পত্তির হিস্যা নিতে এলে তারা কাজী পুলিশের সহযোগিতায় ফেনসিডিল ও জাল টাকা রাখার দায়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে রাজ্জাক কাজীকে গ্রেপ্তার করায়। পুলিশের একটি সূত্র জানায়, এর পেছনে সংসদ সদস্যের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। গত মাসে তারা কাজীর বিরোধিতা করায় পত্নীতলা থানার সাবেক ছাত্রলীগ নেতা, বর্তমান স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য সচিব মিল্টন উদ্দিনকে দুটি মিথ্যা ডাকাতি মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তার করানো হয়। শুধু তাই নয়, বর্তমানে পত্নীতলা উপজেলার উন্নয়নে গঠিত বিভিন্ন কমিটিতে রয়েছে এক কাজী গংদের একক আধিপত্য। এই কমিটির নাম ভাঙ্গিয়ে কাজী গংরা বিভিন্ন সময় পত্নীতলাবাসীর উপর নির্যাতন ও সরকারি বিভিন্ন বরাদ্দ লুটপাট করে থাকে। কমিটিগুলোর অন্যান্য সদস্যরা এসব বিষয় জানলেও কাজী গংদের ভয়ে কেউ তাদের বাধা দেয় না। এই পরিবারের ভয়ে গ্রামবাসী যেমন আতঙ্কিত, তেমনি আতঙ্কে থাকে পত্নীতলা থানার পুলিশ। একই সূত্র জানায়, মজিদ কাজীর পরিবার তথা তারা কাজী, বাবলু কাজী, বুলু কাজী ও বিনু কাজীরাই এখন পত্নীতলার প্রশাসন। তাদের কথামতো থানার পুলিশ চলে। পত্নীতলার সব বিষয়ই তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলে। এদের কাজের বিপক্ষে কোনো পুলিশ অবস্থান নিলে বেশি দিন এই থানায় থাকতে পারে না। এই বদলি আতঙ্কের কারণে তারা কাজী গংদের সঙ্গে পুলিশ সব সময় সমঝোতা করে চলে। আর তাদের এ ক্ষমতার একমাত্র উৎস সংসদ সদস্য শামসুজোহা খান।

নজিপুর গ্রামবাসী জানায়, নওগাঁ সংলগ্ন ধামুরহাটের বস্তাবর, চৌঘাট (নদীপথ), কালুপাড়ায় যত চোরাচালান হয় তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগী এমপি স্বয়ং। তিনি এসব রুটে চোরাকারবারীদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিয়ে থাকেন। অপর একটি সূত্র জানায়, গোপালগঞ্জের ফরিদ নামের এক চোরাকারবারী বছরখানেক আগে নজিপুর দিয়ে ১ কোটি টাকা সমমূল্যের ভারতীয় শাড়ি পাচারের সময় স্থানীয় জনগণ ধরে ফেলে। তা নিয়ে এমপি স্থানীয় জনগণকে হুমকি দিয়ে ফরিদকে তার নিজের লোক পরিচয় দিয়ে চালানটি ছাড়িয়ে নেন। নদীপথে চোরাচালানের রুট চৌঘাট দিয়ে ২৫০ পিস কমোড পাচারের সময় এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে এমপি 'নিজের মাল' বলে ছাড়িয়ে নেন। গ্রামবাসী জানায়, এ রকম আরো বহু ঘটনার নায়ক এমপি স্বয়ং। উল্লেখ্য, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আদম পাচারের অভিযোগে হিথ্রো বিমানবন্দরে তিনি ধরা পড়েন। তখন এ নিয়ে সরকারি পর্যায়ে বেশ তোলপাড় হয়। এমপি জোহার বিরুদ্ধে মামলাও হয়। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই মামলায় জোহা খারিজ পেয়ে যান। জোহা বিএনপি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হলেও বিএনপির ত্যাগী নেতাদের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ এনে হয়রানি করেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে নব্য বিএনপিতে যোগদানকারী কাজী গংদের অবস্থান পত্নীতলা বিএনপিতে স্থায়ী করার জন্য নানা তৎপরতা চালাচ্ছেন।

হত্যাকান্ড সম্পর্কে বক্তব্য

কাজী আখতার বানু হত্যাকান্ডে পত্নীতলাবাসী যেমন হতবাক, তেমনি এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আতঙ্কিত। পত্নীতলা থেকে নির্বাচিত বিএনপি সাংসদ শামসুজোহা খানের সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাতের জন্য তার নজিপুরস্থ বাসভবনে গেলে তিনি সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানান। পরে তার মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে হত্যাকান্ড সম্পর্কে তিনি বলেন, উনার মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। গ্রামের কারো সঙ্গে ওনার কোনো বিরোধ নেই। আমার মনে হয় বাসার কাজের ছেলে হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত। আমি পুলিশকে বলেছি, এ ব্যাপারে জোর তদন্ত চালাতে। আর উনি তো আমার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়। এ হত্যার বিচার আমি চাই। নওগাঁর পুলিশ সুপার ফজলুল রহমান বলেন, কাজী বানু হত্যার ব্যাপারে আমরা তদন্ত চালাচ্ছি। তদন্তের আগে কিছু বলা যাবে না। তদন্তভার সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা যায় কি না- এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অবশ্যই করা যাবে। তবে মামলাটি সিআইডির হাতে গেলে ফ্রিজআপ হয়ে যাবে। তদন্ত রিপোর্ট পেতে ৫-৬ বছর সময় লেগে যাবে। পত্নীতলা থানার ওসি হায়দার আলী মোল্লা বলেন, এই হত্যাকান্ড একজনের পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়। এটা রাজনৈতিক হত্যাকান্ড নয়। সম্পত্তির বিরোধের কারণে হয়েছে বলে মনে হয়। আর আসামি মাসুমকে কেউ স্পাই হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। তবে হত্যাকান্ডের তদন্তকারী সেকেন্ড অফিসার মোস্তফা কামালও সম্পত্তির বিরোধের কথা স্বীকার করে বলেন, আসামি মাসুমকে খুঁজছি। তাকে পেলেই সব রহস্য বেরিয়ে আসবে। সিইডিতে মামলা হস্তান্তরের বিষয়ে তিনি বলেন, আমাকে সময় দিতে হবে। আর সিআইডিতে মামলাটি দিলে তার ফলাফল ভালো আসবে না। মামলাটিও ফ্রিজআপ হয়ে যাবে। নজিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ইসহাক হোসেন বলেন, কাজী বানুকে আমি দীর্ঘদিন ধরে চিনি। আমরা কোনোদিন শুনিনি যে, ওনার সঙ্গে কারো বিরোধ হয়েছে। ওনার বাড়িতে একটা কাজের ছেলে ছিল। যদি ডাকাতি হয়, তাহলে তাকে একটি ঘরে আটকে রেখে ডাকাতি করতে পারতো। কিন্তু তা করেনি। তার মানে এই হত্যায় অন্য কোনো বিষয় সম্পৃক্ত। পত্নীতলাবাসী এ হত্যাকান্ডের পর যেমনি হতবাক, তেমনি তারা এই হত্যাকান্ডের সঠিক বিচার চায়। তারা মনে করে, হত্যাকান্ডের ব্যাপারে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন মাঠে নামলে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে। অন্যথায় সাংসদ জোহা ও কাজী গংরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে। এই মূর্তিমান আতঙ্ক থেকে পত্নীতলাবাসী মুক্তি চায়।